দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 DEC. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবন

■ আবুল মাল আবদুল মুহিত

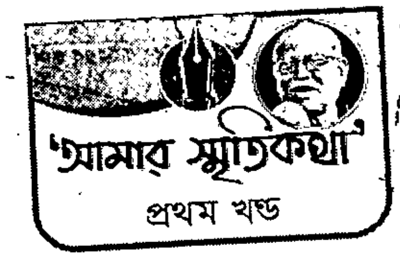

ঢাকায় ছাত্রজীবনের সূচনা

(২ ডিসেম্বরের পর)

মুসলিম লীগ সংসদীয় দলে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ছাড়া অন্য কোন সদস্য এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন না। তাই প্রস্তাবক নূর আহমদও তার প্রস্তাবের পক্ষে কোন বক্তৃতা দিলেন না। প্রস্তাবের সার্বিক বিরোধিতা করে রেকর্ড করেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। কিন্তু গণপরিষদে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই বিষয়ে আপাতত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন নেই; যথাসময়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত হবে। প্রস্তাবের পক্ষে ৭৯ এবং বিপক্ষে মাত্র ১২ সদস্য ভোট প্রদান করেন। এই ১২ সদস্যের মধ্যে ছিলেন পূর্ব বাংলার ৯ জন কংগ্রেস সদস্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সরদার শওকত হায়াত খান, সরদার আসাদুল্লাহ জান খান এবং শেঠ সুখদেব।

১৯৫২ সালের ঢাকার ভাষা আন্দোলনে শুরু থেকেই আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ছাত্র হিসেবে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার সুযোগ হয়নি। আমার সাইকেল ছিল বলে ঢাকার অনেক সরদারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একুশের প্রস্তুতি পর্বে ঢাকার অনেক এলাকা ও সংগঠিত গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। যেমন ওয়ারীর নারী শিক্ষা মন্দির, নারায়ণগঞ্জের মর্গান বালিকা বিদ্যালয়, ওয়ারীর ডাঃ নন্দীর বলয়, পাতলা খান লেনের বেতার শিল্পীদের একটি দল ইত্যাদি। একুশে ফেব্রুয়ারির পর ২৯ ফেব্রুয়ারি আমি সিলেট যাই এবং সেখানে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার সুযোগ হয়। সেখানে আসলে ১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনেই আমি এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিই। ১৯৫২ সালের আরও কয়েকটি ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। আমার মনে থাকার আর একটি কারণ হলো যে, ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে আমি সমসাময়িক ঘটনাবলীর নোট রাখতে শুরু করি। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত আমি নিয়মিত ডায়েরি লিখি। মাঝে মাঝে অবশ্য দু'চার দিনের বিবরণ একদিনেও লিখতাম। পরবর্তীকালে নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝেই ডায়েরি লিখেছি। মার্চ মাসে সিলেটে আমার এক বন্ধুর বিয়ে হয় এবং সেই বন্ধুর বিয়েতে আমি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। ভার্থখোলার আজমল খান ছিলেন একটি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তার বিয়ে হয় নাইওরপুলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মোঃ ইসমাইলের মেয়ের সঙ্গে। এই দম্পতি সারাজীবন ঝগড়া করে এবং আমাকে প্রায়ই মধ্যস্থতা করতে হয়। তাদের মেয়ে অবশ্য বর্তমানে এক সুখী সংসারের সদস্য। তার স্বামী সিলেটের একজন সফল নাটক অভিনেতা নাজিমুদ্দিন লস্কর। এই বছরে আমি প্রথমবারের মতো কলকাতা ভ্রমণ করতে যাই। কলকাতার বিশালতা আমাকে খুবই অভিভূত করে এবং সেখানে ট্রামে চড়ার সুযোগ জীবনে প্রথমবারের মতো ঘটে। কলকাতা যাই ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের বিমানে এবং সেট্যাও ছিল বিমানে প্রথম যাত্রা। তবে প্রত্যাবর্তন করি ২২ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলে গোয়ালন্দ পর্যন্ত, অতঃপর গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জে আমি জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানির জাহাজ এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসি শেভরলেট ট্যাক্সিতে, যার ভাড়া ছিল জনপ্রতি মাত্র আট আনা। কলকাতার গড়ের মাঠ তখন তেমন নোংরা ছিল না এবং রেড রোড এলাকা ছিল পরিচ্ছন্ন। আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে কলকাতা মিউজিয়াম, কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়ার সেতু, কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান, খিদিরপুরের ডক এলাকা এবং চৌরঙ্গী। আমার হোটেল ছিল চৌরঙ্গী এলাকায় আমজাদীয়া হোটেল। সে সময় কলকাতায় প্রথম ১৩ তলা দালান 'কল্যাণ' নির্মিত হয় লাট ভবন এবং সচিবালয় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সন্নিকটে। অনতিদূরেই ছিল গড়ের মাঠ। ১৩ তলা দালানটি দেখতে অনেক লোকের ভিড় হতো এবং দর্শকদের জন্য তখন বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। কলকাতার মোগলাই খানাদানা আমার খুব পছন্দ হয় এবং আমজাদীয়া এজন্য খুবই পরিচিত ছিল। তবে বিলেতি রেস্তরাঁ Firpo-র পেস্ট্রির স্বাদ এখনও জিহ্বায় লেগে আছে। আমার অনেক সময় কাটে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এবং গ্র্যান্ড হোটেলের পাশে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। এখনও কলকাতায় গেলে এই দুটি স্থান আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

এই বছরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ২৮ মার্চ আমার বন্ধু হেদায়েত আহমদ বিমানবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য কোয়েটায় চলে যায়। হেদায়েত অবশ্য কোয়েটায় J.S.P.T.C.S (Joint Services Pre-Cadet Training College and School) বেশিদিন থাকল না। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তসাদ্দুক আহমদ পুলিশের খাতায় কম্যুনিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন এবং তখন সম্ভবত আত্মগোপনে থাকতেন। হেদায়েতকে সরকার এজন্য প্রতিরক্ষা বিভাগের কোন প্রতিষ্ঠানে নিতে আপত্তি করে। মজার ব্যাপার হলো যে, এই হেদায়েত পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং পাকিস্তানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপ-সচিবের পদ (কেবিনেট বিভাগের উপ-সচিব) অলঙ্কৃত করেন। হেদায়েত বিভিন্ন বিভাগে সচিবের দায়িত্ব পালন করে ১৯৯০ সালে অবসরে যান।

আমি পুলিশ সুপার মাসুদ মামুন সম্বন্ধে আরও কথা বলব বলে অঙ্গীকারবদ্ধ। মাসুদ মামুন সম্ভবত ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সুপিরিয়র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি শুরু করেন। তিনি উগ্র প্রকৃতির লোক ও পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঢাকার সিটি পুলিশ সুপার হিসেবে তিনি জিহাদী মনোভাব নিয়ে পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে ছাত্র দমন উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন। তার বড় কর্তা পুলিশ সুপার ইদ্রিস সাহেবের ভূমিকা ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ। মাসুদ মামুন কিছু দিন পর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানেও একজন উগ্রপন্থী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৮ ও '৬৯ সালে তিনি সহসা অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ও. এস. ডি) হিসেবে আমার দফতর কেন্দ্রীয় কেবিনেট বিভাগে যোগ দেন এবং আমি ওই বিভাগ ছাড়া পর্যন্ত (১৯৬৯ আগস্ট) সেখানে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তিনি আমার কর্তৃত্বাধীনেই ছিলেন। তাকে ১৯৫২ সালের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। কারণ তার উগ্রতা সহজেই প্রতিভাত হতো। আমি বিদেশে পদায়িত হওয়ার পর পাকিস্তানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে যায় ১৯৭১ সালের জুন মাসে। তারপর আমি পাকিস্তানে যাই বস্তুতপক্ষে ১৯৯২ সালে। ইতোমধ্যে এই মাসুদ মামুন পাকিস্তানে খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হয়ে যান। তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর যখন মেকি বিচার অনুষ্ঠিত হয় তখন সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ভুট্টোর হুকুমে খুন-খারাবি করেছেন। তিনি ভুট্টোর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের মামলায় রাজসাক্ষী ছিলেন। তার জীবনের ইতি কিভাবে হয়েছে তা আমার জানা নেই, তবে ফাঁসিতে হবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল।

আমি আমার বাল্যবন্ধু দেওয়ান আহমদ কবীর চৌধুরীর কাহিনীও বলব বলে আগে জানিয়েছি। কবীর ছিল খুব মজার মানুষ এবং বাস্তব জীবনে সে অনেক বিষয়ে ছিল জ্ঞানী, নিবেদিত এবং গুণী। বাল্যবেলা থেকেই সে খুব আকর্ষণীয় বালক ছিল এবং পূর্ণ বয়সেও তার আকর্ষণ ছিল মোহনীয়। তার উজ্জ্বল ফর্সা চেহারা এবং কোঁকড়া চুল শেষ বয়স পর্যন্ত বজায় ছিল। একটি মাত্র পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল তার দাঁতে। সে খুব পান-সুপারি খেত এবং জর্দা তাতে থাকতই। জর্দা সেবনের ফলে তার সাদা দন্তের চাকচিক্য কমে যায়। তার কথাবার্তার ধরন ছিল একটু আলাদা। তার ছিল পাগলাটে পাগলাটে ভাব অথবা খুব সিরিয়াস। কিন্তু কখন যে সে ভান করছে আর কখন যে সত্যি সত্যিই সিরিয়াস তা বুঝতে সময় লাগত। সিলেটে আমরা বাল্যকালেই বন্ধু বনে যাই। তার আব্বা ছিলেন আমাদের প্রিয় এমএলসি চাচা খান বাহাদুর দেওয়ান আবদুর রহিম চৌধুরী এবং তার আম্মাও ছিলেন বিখ্যাত জননেত্রী বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী। দেওয়ান আবদুর রহিম চৌধুরী ছিলেন হবিগঞ্জের পানি উমদার বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের শিক্ষিত উকিল। তার জন্ম হয় ১৮৯০ সালে এবং তিনি সিলেটে আইন ব্যবসা শুরু করেন সম্ভবত ১৯২০-এর দশকে। ১৯৩০ সালে তিনি প্রাদেশিক উচ্চ পরিষদে নির্বাচিত হন (সেজন্যই তাকে আমরা এমএলসি চাচা ডাকতাম)। ১৯৩৪ সালে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন এবং এই পদ থেকে অবসর নেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সামান্য পর। তিনি ১৯৮৪ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। বেগম চৌধুরী ছিলেন একজন সুদক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণের খান বাহাদুর শরাফত আলীর প্রথম কন্যা (১৯০১-১৯৮৬), যিনি শৈশবে (১৯০৬ সালে) ঢাকার ইডেন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৯১৯ সালে তার বিয়ের পর কিছুদিন তিনি শ্বশুরালয়ে থেকে অবরোধ প্রথাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করেন। সিলেটে আসার পর তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯৩০ সালে তিনি হন ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা কংগ্রেস শাখা সিলেট মহিলা কংগ্রেসের বস্তুতপক্ষে প্রথম সভানেত্রী। কিছুদিনের জন্য সভানেত্রী ছিলেন লাবণ্যপ্রভা দেবী (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর)। তার আর এক কৃতিত্ব ছিল ১৯২৮ সালে তিনি এবং তার ছোট বোন শাহিদা চৌধুরী (অধ্যক্ষ আবদুল মুনিম চৌধুরীর স্ত্রী) সিলেটে অনুষ্ঠিত মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন। এই সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন তার পিতা এবং অতিথি ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক, কবি নজরুল ইসলাম ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই ঘটনাটি ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কবীরের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই সুযোগটি আমি কোনমতেই ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম না। কবীরের আম্মা ছিলেন অত্যন্ত কর্মদক্ষ মহিলা সংগঠক ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেত্রী। তিনি প্রায় জোর করে আমার আম্মাকে সমাজসেবা ও রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তিরিশের দশকের শেষ লগ্নে কংগ্রেসের রাজনীতি পরিত্যাগ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে এবং আমার আম্মাকে করেন সহ-সভাপতি ও সৈয়দ লুৎফুন্নেসা চৌধুরীকে করেন সম্পাদক। মাহমুদের আম্মা সৈয়দ নজিবুন্নেসা ছিলেন তার আর এক সহকর্মী। এই প্রতিষ্ঠানই ১৯৪৭-এ মুসলিম মহিলা লীগে রূপান্তরিত হয় ও সিলেটের গণভোটে মূল্যবান ভূমিকা রাখে।